গল্প

একান্নবর্তী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একান্নবর্তী

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেন। সে কেরানি। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশ টাকায় শুরুর গ্রেডে সরকারি চাকরি পেয়েছে আর বছর। হীরেন সাতাশ টাকার কেরানি, যুদ্ধের দরুন। পাঁচ-দশ টাকা বোনাস এলাওন্স বুঝি পায়। হীরেনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু শরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরি বাড়িটাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে বাজার করে বেঁধে বেড়ে, ঝি চাকর ঠাকুর, শুধু নিজেদের ভালোমন্দ সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো তারা বাস করে। হঠাৎ টান পড়লে একটু চিনি, দু-পলা তেল বা এক খাবলা নুন ধার নেওয়া হয়, এ সংসার থেকে ও সংসারে দান হিসেবে নয়। দু-চার দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রেশনের বা কালোবাজারের মাল আনা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত মাপে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বড় দু-ভাইয়ের বৌদের তরফের কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিশেষ কোনো উপলক্ষে খাবারটাবার মাছটাছ এমন জিনিস যদি এত বেশি পরিমাণে আসে যে নিজেরা খেয়ে শেষ করবার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়তিটা ভাগ করে দেওয়া হয়। হীরেনদেরও দিতে হবে। কেরানি বলে তার বৌ এসেছে গরিব পরিবার থেকে, তার বাপের বাড়ির দিক থেকে কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেবার মতো, কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেখানোর মতো, কখনো আসবেও না, তবু উপায় কী। এটাই আসল কথা তাকে নিয়ে লজ্জা পাবার। একেবারে অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো বাস করুক, বাস তো করে একই বাড়িতে, সবাই তো জানে সে তাদের ভাই, আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শি সকলে। সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোনোমতেই।

বিশেষত বুড়ি মা আছেন হীরেনের দলে। প্রায়ই তিনি অসুখে ভোগেন, সর্বদা জপতপ নিয়ে থাকেন। খান তিনি নিজের খরচে, কিন্তু তার দুধটুকু জ্বাল দেওয়া, দইটুকু পেতে

রাখা, চাল ডাল তরকারিটুকু সিদ্ধ করে দেওয়া, এসব করতে হয়। হীরেনের বৌকে। অসুখেবিসুখে ব্রত পার্বণে বাড়তি দরকারের জন্য বৌদের ডেকে হুকুম দেন কিন্তু রোজকার খুঁটিনাটি সেবা গ্রহণ করেন শুধু হীরেনের বৌয়ের কাছ থেকে। তার রেশন কার্ড, কার্ডের মাল হীরেন পায়, মাসে দেড় মণ দুমণ কয়লার দাম তিনি দেন, ঠিকা ঝির আট টাকা বেতনের দুটাকা দেন আর সাধারণভাবে সংসার খরচের হিসাব দেন দশ টাকা।

হীরেন ছাড়া সব ছেলের কাছে তিনি ভরণপোষণের মাসিক খরচও নিয়মমতো আদায় করেন কড়াকড়িভাবে। বীরেনের পসার বেশি, সে দেয় তিরিশ টাকা। ধীরেনের পসার হচ্ছে, সে দেয় কুড়ি টাকা। চাকরি হবার পর নীরেন বিশ বা পঞ্চাশ। মা যা চাইতেন তাই দিত, আজকাল বড় বৌয়ের পরামর্শে দায়টা মাসিক পঁচিশ। টাকায় বেঁধে দিয়েছে। নীরেনের বৌ নেই। এখনো বিয়ে করেনি।

ভাইরা যখন ভাগ হয়, এক বাড়িতে উনান জ্বালাবার আয়োজন করে তিনটে, চটে লাল হয়ে গিয়েছিল নীরেন, লজ্জায় দুঃখে দাপাদাপি করে গালাগালি দিয়েছিল দাদাদের, বিশেষভাবে বড় দুজনকে। তখনো তার চাকরি হয়নি। তার খাওয়া-পরা, পড়াশোনার খরচ দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে বিশেষ করে ভাইরা ভিন্ন হচ্ছে মনে করে আঁতে তার ঘা লেগেছিল। আরো তার পড়বার ইচ্ছা ছিল, বিলাত যাওয়ার কথাটাও নাড়াচাড়া করছিল মনে মনে। এ সময় এ রকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটাতে তার আঁতকে ওঠার কথাই।

হীরেন তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, কেন, এ তো ভালো হল! রোজ বিশ্রী খিটখিটে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কী মন কষাকষি বল তো? দাদার আয় বেশি, তিনি ভালোভাবে থাকতে চান। মেজদার ভালো উপার্জন হচ্ছে তিনিও খানিকটা ভালোভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশটা টাকা দিয়ে মজা করব, ওরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারো মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়াখাওয়ি কামড়াকামড়ি করেও একসাথে থাকতে হবে ভাই সেজে? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভাইয়ের বদলে ভদ্রলোকের মতো থাকাই ভালো।

তোমার চলবে?

চলবে না? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্যদিকে লাভ হবে। মাথা হেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুদকুঁড়ো হজম হবে।

নিজে ভিন্ন হলেই পারতে তবে এতদিন।

অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে কিনা কথাটা হল এই যে–

দুঃখী অসহায় গরিব কেরানি ভাইকে দয়া বা শ্রদ্ধা করে নয়, বড় বড় দুভাইয়ের ওপর নিদারুণ অভিমানের জ্বালায় নীরেন আরো পড়েশুনে আরো পরীক্ষা পাস করে বড় কিছু হবার কল্পনা ছেড়ে চাকরির চেষ্টায় নেমেছিল। মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হীরেনের সংসারে।

চাকরি হবার পরেও, দুশ টাকার শুরুর গ্রেডের সরকারি চাকরি হবার পরেও প্রায় দুমাস হীরেনের সংসারে ছিল।

তিন সংসারের পার্থক্য ততদিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বড়বৌ পুলকময়ী আর মেজবৌ কৃষ্ণুপ্রিয়া চটপট অদল-বদল করে নিজের নিজের সংসার সেজে ঢেলে গুছিয়ে নিয়েছে। আগেকার সর্বজনীন ভাড়ারঘরটা ভেঙেচুরে নতুন জানালা দরজা তাক বসিয়ে পুলক করে নিয়েছে ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো, আলো-বাতাস ভরা বড় আধুনিক রান্নাঘর। দেখে বুক ফেটে গেছে কৃষ্ণ প্রিয়ার আফসোসে। সে যদি চেয়ে নিত ভাড়ারঘরটা রান্নাঘর করার জন্য। উনান টুনান বসানো নতুন তৈরি রান্নাঘরটা পেয়ে ভেবেছিল, খুব জেতা জিতে গেছে, ভাবতেও পারেনি দিন কয়েক বারান্দায় তোলা-উনানে রান্নার কষ্ট সহ্য করে ভাড়ারঘরকে এমন সুন্দর রান্নাঘর করা চলে। সেজবৌ লক্ষ্মীও তাকে ঠকিয়ে জিতে গেছে পুরনো নোংরা রান্নাঘরটা পেয়ে। মেঝেতে ফাটল আর গর্ত কালি-ঝুল মাখা চুন-বালি খসা দেয়াল, একটু অন্ধকার কিন্তু ঘরটা মস্ত বড়, মিস্ত্রি লাগিয়ে কিছু পয়সা। খরচ করলে ওই ঘরখানা দিয়েই বৌকে হারানো যেত।

চাকর বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, পুলকময়ী ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে আর ছেলেমেয়েকে সাজায়, পাড়া বেড়ায়, নিন্দে করে কেরানি দেওর আর তার বৌয়ের। ধীরেন বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাধে, কৃষ্ণুপ্রিয়া সস্তা চটকদার আসবাব ও শাড়ি কিনে বড় বৌয়ের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেবার চেষ্টায়, নিজের ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে, মেয়েটাকে সাজায়, অর্গান বাজিয়ে গান করে, কেঁদেকেটে চিঠি লিখে ঘনঘন বড়লোক মামা-মামি মামাতো ভাইবোনদের দামি মোটরে চাপিয়ে বাড়ি আনায় পাড়ার লোকের কাছে নিজেকে বাড়াবার জন্য, ফরসা রং আর থলথলে মাংসল যৌবনের গর্বে মাস্টারনির মতো পাড়ার মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে-বৌয়ের শোচনীয় রূপের অভাব, বানিয়ে বানিয়ে যা মুখে আসে বলে। যায়, শাশুড়ি ননদ জা দেওরদের বিরুদ্ধে।

তবু, পুলকময়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না বলে জ্বলেপুড়ে মরে যায়। যুদ্ধের বাজারে বীরেনের পসার বড় বেশি বেড়েছে, দুটাকার বদলে আট টাকা ফী করেও গাদা গাদা কল পাচ্ছে, ঘরে এনেছে দামি আসবাব, পুলককে দিয়েছে শাড়ি গয়না, মোটর কিনেছে সেকেন্ডহ্যান্ড, জমি কিনেছে সেকেন্ডহ্যান্ড, জমি কিনে আয়োজন। করছে বাড়ি করবার। ধীরেনেরও ওকালতিতে পসার বেড়েছে বেশ, তবে বীরেনের ডাক্তারি পসারের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

ভেবেচিন্তে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়াল নীরেনের দিকে। মাসে চারশ পাঁচশ টাকা। আনছে ছেলেটা মাইনে আর উপরিতে, বিয়ে করেনি, বৌ নেই।

নীরেনও যেন তার হাত বাড়ানোর জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল। হীরেনের সংসারের অশান্তি, উদ্বেগ আর অভাবের সঙ্গে একটানা লড়াই, মার গুমখাওয়া একগুঁয়ে। সেকেলে ভাব জীবনে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। প্রায়ই তাকে বাজার করতে হয়, প্রায়ই তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় রেশনের লাইনে, মার আবদার আর হুকুম সমানে। চলেছে তারই ওপরে, আর যেন তার ছেলে নেই। তাছাড়া, সব বড় ভোতা, বড় নোংরা। বড়বৌ আর মেজবৌয়ের

প্রায় চার বছর পরে বৌ হয়ে এসেছে লক্ষ্মী, তার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ওদের দুজনের ছেলেমেয়ের সমান। সারাদিন সে শুধু রাধছে। বাড়ছে, ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, বুড়ি শাশুড়ির সেবা করছে, গাদা গাদা জামাকাপড় সিদ্ধ করছে, কপালকে দোষ দিচ্ছে, সর্বদা বলছে : মরলে জুড়োব, তার আগে নয় ঘর-সংসার সে সাজায় গোছায় অতি যত্নে, পুরনো বাক্স পেঁটরা, রংচটা খাট-চেয়ার, ছেঁড়া কাপড়-জামা, ময়লা কথাকানি নিয়ে যতটা সাজাতে গোছাতে। পারে। রান্নাঘর ধোয়ায় দুবেলা-নোংরা রান্নাঘর, এ ঘরে রান্না-করা ডাল ভাত মাছ। তরকারি খেতে ঘেন্না করে নীরেনের। খেতে বসলে আবার প্রায়ই পুলক বা কৃষ্ণুপ্রিয়ার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে ঘি মাংস পেঁয়াজ এলাচের গন্ধ।

ঠাকুরপো, কাল তোমার নেমন্তন্ন। নিজে বেঁধে খাওয়াব।

কৃষ্ণুপ্রিয়া বললে একদিন হাসিহাসি মুখে। সহজে সে হাসে না, তার দাঁতগুলো খারাপ।

এমন অগোছালো কী করে থাক ঠাকুরপো? ছি, ছি, চারদিকে ঝুল, খাটের নিচে নরক হয়েছে ধুলো জমে। কী ছড়িয়ে ভড়িয়ে রেখেছ সব। এতগুলো টাকা ঢালছ। মাসে মাসে, ঘরটাও কি কেউ একটু সাফসুরত করে দিতে পারে না তোমার?

তখন তখন নিজের ঝিকে নিয়ে ঝুল ঝেড়ে ধুয়েমুছে সাফ করে কৃষ্ণপ্রিয়া, ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আগে থেকেই সে ঠিক করে এসেছিল এটা সে করবে, নীরেন বুঝতে পারে। স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আগে এসেছে পরদিন খেতে বলতে। ধুলো ঘেঁটে ঝুল মেখে ঘর সাফ করে সাবান মেখে স্নান করবে। খুশিই হয় নীরেন টের পেয়ে। খাতির পেয়ে অসুখী হবার কী আছে।

খেয়ে আরো খুশি হয় নীরেন। সব রান্নাই প্রায় ঠাকুরের, দুটি বিশেষ জিনিস শুধু কৃষ্ণুপ্রিয়া বেঁধেছে। লক্ষ্মীর কোনোমতে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দায়সারা একঘেয়ে রান্না নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের নোংরামি-ঘাটা কোনো মানুষের রান্না নয়, অপরিষ্কার স্যাঁতসেঁতে ঘরে পুরনো মলিন পাত্রে মটকাহীন মরচেধরা টিনের কৌটার মসলার রান্না নয়। পরিবেশনে বারবার ব্যাঘাত নেই অন্য ঝামেলার, পরিবেশকের ভাবভঙ্গিতে নেই

খাইয়ে দিয়ে আরেকটা হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার অধীরতা। পরিবেশক মাইনে-করা ঠাকুর। বসে বসে ধীরে সুস্থে হাসিগল্পের সঙ্গে একসাথে খাওয়া।

কৃষ্ণপ্রিয়া চালিয়ে যায় টানার আয়োজন, ওদিকে এতদিন পরে হীরেন আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নীরেনের বাধতে থাকে খিটিমিটি।

মাসের শেষে আরো কয়েকটা টাকা সংসারে দরকার হলে নীরেন বলে, আমি টাকা দিতে পারব না। যা দিয়েছি আমার একার জন্য তার সিকিও লাগে না।

হীরেন বলে, তা লাগে না। কিন্তু তুই একা মানুষ কী করবি অত টাকা দিয়ে?

যাই করি না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাধে অন্যভাবে, অনেকভাবে।

ছুটির দিন একটু দেরি করেও খেতে পারব না খুশিমতো?

ঠাকুর রেখে দাও, যত খুশি দেরি করে খেয়ো। চোখ নেই তোমার ঠাকুরপো? দেখতে পাও না সেই কোন ভোরে উঠে জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি? দেড়টা বাজে, এখনো বলছ রান্নাঘর আগলে বসে থাকতে?

আমি যে টাকা দিই–

টাকা দাও বলে বাদী কিনেছ আমায়?

এই দোষ লক্ষ্মীর, খাতির করে না, এতগুলো করে টাকা নীরেন ঢালে তার সংসারে, তবু। হীরেনও যেন কেমন ভাব দেখায়, ঠিক ছোট ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে তার সঙ্গে। মাসে মাসে এতগুলো টাকা সাহায্য করেও সংসার সে চালু রেখেছে, একটু যে বিশেষ তার সঙ্গে একটু বিশেষ মিষ্টি সুরে কথা বলবে তার সঙ্গে সে চেষ্টাও নেই। মোটেই যেন কৃতজ্ঞ নয়, অনুগত নয় দুজনে। হাড়ভাঙা খাটুনি আছে, অভাব অনটন চিন্তাভাবনা আছে,

ঝঞ্ঝাট আছে অঢেল, কিন্তু সেইজন্যেই তো তাকে বেশি করে খাতির করা উচিত। তার সাহায্য বন্ধ হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে ওরা কি ভাবে না? এত ভাবে, এ কথাটা ভাবে না। নীরেন নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় ভেবে।

পরের মাসের পয়লা থেকে নীরেন ভিড়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার সংসারে। হীরেনকে কিছু কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা তার ছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে সে ইচ্ছাকে ফাঁসিয়ে দিল। বুড়ি মাকে মাসে মাসে সে চল্লিশ টাকা দেবে ঠিক হয়েছে। বুড়ি কি খাবে ও টাকাটা? হীরেনকেই দেবে। ও চল্লিশ টাকা একরকম সে হীরেনকেই দিচ্ছে। সোজাসুজি আরো দেবার কি দরকার আছে কিছু? না সেটা উচিত? ওরা তো যত পাবে ততই নেবে, কিছুতেই কিছু হবে না ওদের।

তলে তলে টাকা জমাচ্ছে। বাইরে গরিবানা। বুঝলে না ঠাকুরপো?

কৃষ্ণপ্রিয়াকে নিজের জন্য খরচের টাকা দিয়ে প্রতিদানে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা পেয়ে পুলক বোধ করে নীরেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর হাতে খরচের টাকা দিয়েছে, খরচ করে যা বেঁচেছে ব্যাংকে জমা দিয়ে এসেছে, লক্ষ্মী নির্বিকারভাবে আঁচলে বেঁধেছে নোটগুলো, ব্যাংকের লোকেরা যেন তাকে গ্রাহ্যও করেনি। কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে নোটগুলো দিতেই আনন্দে সে এমন বিহ্বল হয়ে যায়! কথা বলতে গিয়ে এমন করে তোতলায়।

হেস্তনেস্ত যা হবার তা হল, পৃথিবীজোড়া মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে তাদের পারিবারিক যুদ্ধ পর্যন্ত। যার যা দখল সে তা নিয়েছে, যে যেভাবে যার সাথে বাঁচতে চায়, সে সেইভাবে তার সাথে বাঁচবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেনা জমিটাতে এবার বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবে ভাবছে বীরেন। ইট বালি চুন সুরকি পাওয়া যাচ্ছে, লোহা এবং সিমেন্টও পাওয়া যাচ্ছে তলায় তলায়, কিছু বাড়তি খরচ আর ধরাধরি করার বিশেষ চেষ্টায়। কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ে খুঁজছে নীরেনের জন্যে, বাংলাদেশে একটিও মেয়ে মিলছে না পছন্দমতো, মেয়েদের যেন মেয়ে রেখে যায়নি যুদ্ধটা। মা জপতপ কমিয়েছেন। ভাবছেন

তীর্থে যাবার কথা। ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, গাড়ির কষ্ট আর বিদেশের অনিয়ম তাঁর সইবে না, মরে যাবেন।

মরতেও পাব না আমি। এ হতভাগার জন্য মরবারও জো নেই আমার। দুর্বল ক্ষীণস্বরে বুড়ি মা কাতরিয়ে কাতরিয়ে আফসোস করেন, হঠাৎ গুম খেয়ে আশ্চর্যরকম শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, আমি মরলে তো না-খেয়ে মরবি তোরা, গুষ্টিসুদ্ধ?

হীরেন বাহাদুরি দেখায় না, ক্ষীণ দুর্বল সুরে বলে, কেন অত ভাবছ বলো তো মা? অত সহজে কি মানুষ মরে? দুর্ভিক্ষে দেখনি, একটু খুদ একটু ফ্যান খেতে পেয়ে কত লোক বেঁচে গেছে। তুমি এখন মরলে যেটুকু ভদ্রভাবে বাচছি তা থাকবে না বটে, ভদ্রত্ব ছাড়লে কি মানুষ বাঁচে না তাই বলে? চারটে ছেলেমেয়ের জন্য রোজ একপো দুধ, হপ্তায় দুদিন একপো মাছ, তা-ও নয় বন্ধ করব, রেশনের চাল আর চার। পয়সার পুঁইশাক বেঁধে খাব। আমি বাঁচব, তোমার বৌটা বাঁচবে, ছেলেমেয়ে কটাও বাঁচবে দেখো। তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, এভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না।

কী বললি?

বললাম বাঁচা কষ্ট বলে কি সাহেবের গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরব? সাহেবের টুটিটা কামড়ে ধরে মরব। অত ভাবছ কেন? মরব না। কেউ আমরা মরব না।

বুড়ি মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তীর্থে যাবার ছুতো করে এবার মরলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতে সামান্য একটা অসুখ হয়ে, চার ছেলের চেষ্টা বিফল করে, চৌষট্টি টাকা ফী-র ডাক্তারের ওষুধকে তুচ্ছ করে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মারা গেলেন। তখন আরো শোচনীয় হয়ে পড়ল হীরেনের অবস্থা।

পুলকময়ীর ও কৃষ্ণপ্রিয়ার শাড়ি গয়না ঠাকুর চাকর, নিশ্চিত নির্ভর চালচলন, অবসর, শৌখিনতা, ভালো ভালো জিনিস খাওয়া, হাসি আহ্লাদ করা সবকিছু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশা হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে লক্ষ্মীর মন। মনে সে এই ভাবনার মলম দিয়ে

সামলে থেকেছে যে বেশ্যারা পরম সুখেই থাকে। স্বামী পুত্র বুড়ি শাশুড়ির জন্য জীবনপাত করে খাটা, শাক-পাতা ডাল-ভাত পেটে গুঁজে কাজ করা, এ গৌরব ওরা কোথায় পাবে। নিজের মনে সে গজরগজর করছে, মরণ কামনা করছে শুধু গোপনে নিজেকে শুনিয়ে, হীরেনের ওপর ঝাঁজ ঝেড়েছে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরদিনের চলিত দাম্পত্য কলহের মধ্যে।

কিন্তু এবার আর সইল না।

চারটি ছেলেমেয়ের দুটি বড় হয়েছে, তারা শাক-পাতা ডাল-ভাত খেতে পারে, অন্য দুটিকেও তাই খাওয়ানো যায় কিছু কিছু, কিন্তু একটু তো দুধ চাই? একপে দুধ আসত, সেটা বন্ধ হল। সপ্তাহে দুদিন মাছের আঁশটে গন্ধ নাকেমুখে লাগত, তা আর লাগে না। যে সায়াটা ন্যাকড়ার কাজে লাগাতে হয়েছে, কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো থলথলে যৌবন না থাক সে-ও তো যুবতী, বয়স তো তার মোটে সাতাশ বছর, সায়াহীন ছেঁড়া কাপড়ে দেহ ঢেকে তাকে চলতে ফিরতে হচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই। কী এক কলাকৌশল জেনেছে হীরেন, অভয় দিয়ে বলছে যে ভয় নেই আর ছেলেমেয়ে হবে না। এসব কি সত্যি? কখনো হতে পারে সত্যি মানুষের জীবনে? এসব ফাঁকি, এসব যুদ্ধের বোমা, এসব ভূমিকম্পের দিশেহারা পাগলামি, বাঁচতে হলে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে, নইলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। ছাতের আলসেয় উঠবার সময় হীরেন তাকে আটকায়। এত এলোমেলো কথার পর এতরাত্রে তাকে ছাতে যেতে দেখে আগেই সে খানিকটা অনুমান করেছিল।

আমি যদি মরি তোমার তাতে কী? লক্ষ্মী বলে ঝাঁজের সঙ্গে, ছাড়া পাবার জন্য লড়তে লড়তে হীরেনের বাহুমূলে কামড় বসিয়ে দিয়ে। হীরেন জানে লক্ষ্মীকে, ভালোভাবেই জানে, সে তার চারটি সন্তানের মা।

কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে বলে, তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী।

চমকে থমকে যায় লক্ষ্মী। নিজের কথা ভাবছি? আমি মরলেই তো তোমার ভালো।

ভালো? তুমি মরলে আমি বাঁচব?

বাঁচবে না? আমি মরলে তুমি বাঁচবে না? দাঁড়াও বাবু, ভাবতে দাও।

বাঁচবে না? সে হার মেনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলে হীরেনও মরবে অন্যকোনো রকমে। তাই হবে বোধ হয়। যে কষ্ট আর তার সইছে না সেই কষ্ট তো লোকটা তারই সঙ্গে সমানভাবে সয়ে আসছে আজ দশ-এগার বছর। তাই বটে। লোকটা অন্য সব দিকে অপদার্থ হোক, এই এক দিকে খাঁটি আছে।

আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। কতকাল জেগে আছি বলো তো। একটু ঘুমাব আমি।

ঘরে ফিরে গিয়ে চাদরহীন তুলো গিজগিজ-করা ছেঁড়া তোশকে হীরেনের বুকে মাথা রেখে সে জেগে থাকে। হীরেনের কথা শোনে।

সাতটা দিন সময় দেবে আমাকে লক্ষ্মী? আমি বুঝেও বুঝি নি। যা করা দরকার করেও করিনি। মাছিমারা কেরানি তো। এইরকম স্বভাব আমাদের। যাই হোক, তুমি আমায় সাতটা দিন সময় দাও।

ওমা, কিসের সময়?

তুমি কিছু করবে না, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বে না–

আমি গিয়েছিলাম নাকি লাফিয়ে পড়তে? লক্ষ্মী রাগ করে বলে, আমি যাইনি। কিসে যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।

সাত দিন সময় চেয়ে নেয় হীরেন, কিন্তু ব্যবস্থা সে করে ফেলে একদিনের মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে দুঃখে ম্লান হয়ে লক্ষ্মী শুধু ভাবে যে, এত দুঃখের মধ্যে একটা খাপছাড়া পাগলামি করে বসে না জানি মনে কত দুঃখ বাড়িয়েছে সে লোকটার।

রাত নটায় হীরেন বাড়ি ফেরে। কচু সিদ্ধ আর ঝিঙে চচ্চড়ি দিয়ে দুজনে একসঙ্গে বসে ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রাত ১১টার সময়। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, কোথায় ছিলে?

পাড়াতেই ছিলাম। রমেশ, ভূপেন আর কানাই আমারই মতো কেরানি, চেন তো ওদের? ওদের বাড়িতে। ভালো কথা, কাল ভোরে ওদের বৌরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।-বুঝেছি। তোমার তিন বন্ধুর তিন বৌ আমাকে কাল বোঝাতে আসবে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়া কত অন্যায়।

না ওরা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে আসবে, ওদেরও যাতে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার দরকার না হয়।

মোরগ-ডাকা ভোরে এল লতিকা, মাধবী আর অলকা। সঙ্গে এল এগারটি কাচ্চাবাচ্চা। আর বাজারের থলিতে ভরা চাল ডাল তরিতরকারি, বোতলে ভরা। সরষের তেল, ভাঙা টি-পটে নুন, বস্তায় ভরা আধ মণ কি পৌনে এক মণ কয়লা। কচিদের মাই দিয়ে ছড়া গেয়ে গা চুলকে থাপড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রাখা হল হীরেনের শোবার ঘরে! বাড়তি ছোট ঘুপচি ঘরখানা সাফ করে রাখা হল চাল ডাল। তেল নুন তরিতরকারি। লতিকা উনানে আঁচ দিল, হীরেনদের রাত্রের এঁটো বাসন। মাজতে গেল কলতলায়।

উনানে প্রথমে কেটলিটা চাপিয়ে সেটা নামিয়ে নিয়ে মাধবী চাপাল বড় স্যসপ্যানটা।

আমাদেরই কম পড়ত এক কেটলি চায়ে, দুজন ভাগীদার বেড়েছে। তুমি চা খাও তো ভাই লক্ষ্মী? জানি খাও। কে না খায় চা?

লক্ষ্মী জিভ কামড়ায়, জোরে কামড়ায়। ঘুমিয়ে না হয় স্বপ্ন দেখে আবোল-তাবোল অনেক কিছু, জেগেও স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন সে করে না। দুর্বোধ্য যা-তা কথার ব্যাখ্যা

শুনে বুঝতে তার ইচ্ছা হয় না। এরা সবাই তার চেনা। আশপাশে থাকে। তার মতো গরিব কেরানির বৌ। চা রুটি খাওয়া থেকে ডাল-ভাত খাওয়ার সব ব্যবস্থা এরা নিয়ে এসেছে। তার চিনিটুকু, চালটুকু কালকের বাড়তি তরকারিটুকু, তেল নুনটুকু নিয়ে বাড়তি ছোট ঘরটায় জমা করেছে, নিজেদের সঙ্গে আনা জিনিসের সঙ্গে।

লতিকা বলে, বাঁচলাম ভাই। তিন বাড়ির খাওয়ার জিনিস বাসনপত্র-জায়গা পাই না, সব ছড়িয়ে থাকে, এ ঘরটা ছোট হোক ঘুপচি হোক, খাসা ভাড়ারঘরের কাজ দেবে।

মাধবী বলে, মস্ত রান্নাঘর। দুশ লোকের রান্না হয়। বাঁচা গেল।

অলকা বলে, ভালোই হল, তুমিই দলে এলে ভাই লক্ষ্মী। তিনজনে মিলে খরচ কমিয়েছিলাম, এবার আরো কমবে। পালা করে রাঁধব বাড়ব তারও একটা জায়গা। নেই ভালোমতো, না ভঁড়ার না রান্নাঘর, কী যন্ত্রণা বলো দিকি।

অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে লক্ষ্মীর। সারাদিন চুপচাপ থেকে রাত্রে সে হীরেনের কাছে জবাব চায়।

লাগবে না? চার বাড়ির চারটে উনানে কয়লা পোড়ার বদলে একটা উনানে পুড়ছে। চার বাড়ির এক দিনের কয়লা খরচে চার দিন না চলুক, তিন দিন তো চলবে? চারটের বদলে একটা ঝিতে চলবে। চারজনের বাজার যাওয়ার বদলে পালা করে এক জনের গেলেই চলবে। চারজনের রাধার বদলে এক জনের রাঁধলেই। চলবে-চার দিনে তিন দিন ছুটি। এমন তো নয় যে অনেক দূর থেকে ভাত খেতে আসতে হবে কাউকে? চার-পাঁচ হাত উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ডাল ভাত খাওয়ার বদলে দশ-বিশ হাত রাস্তা পেরিয়ে এসে খাওয়া এইটুকু তফাত। তার তুলনায় সুবিধা কত।

লতিকা আজ রাধবে। একা যখন ছিল, নিজের বাড়িতে রোজ রাঁধতে হত, এখন এক দিন বেঁধে সে তিন দিন ছুটি পায়। একদিন মানুষের খাওয়ার মতো কিছু যদি রাধত তো দুদিন

কী রাঁধবে, কার পাতে কী দেবে ভেবে পেত না, আজ সে ভালো মাছ তরকারি রাঁধতে পেরেছে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই।

তিন দিন পরে এই চার অনাত্মীয় পাড়াপড়শি একান্নবর্তী পরিবারের জন্য রান্না করার ভার পায় লক্ষ্মী। বিয়ের পর একটানা তিন দিন বিশ্রাম ভোগ করা তার জীবনে এই প্রথম জুটেছে। ছেলে বিয়োতে আঁতুড়ে গিয়ে রান্নাবান্না না করতে হওয়াটা ছুটি নয়, ছেলে বিয়োনোর খাটুনি ঢের বেশি রান্নাবাড়ার চেয়ে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, লতিকা, মাধবী, অলকা তোরাই আমায় বাঁচালি। লতিকার ছেলে, মাধবীর মেয়ে, অলকার ভাই, এই তিনজনের সঙ্গে নিজের বাচ্চা দুটোকে সে দুধ খাওয়ায়। ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে শুধু সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।